দ্য ক্রসিং

[বিধ্বস্ত সিরিয়ার হৃদয় হতে এক নারীর
অনিঃশেষ যাত্রার ধারাবর্ণনা]

সামার ইয়াজবেক

অনুবাদ : তানজিনা বিনতে নূর

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮৪৪১

সীমান্তে প্রথমবার

[আগস্ট ২০১২]

কাঁটাতারে জড়িয়ে আমার পিঠ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁপছিলাম আমি। তুর্কি সেনাদের দৃষ্টি এড়াতে দীর্ঘ সময় ধরে রাত নামার প্রতীক্ষা করছিলাম। অবশেষে মাথা তুলে ওপরে তাকালাম, সন্ধ্যার আকাশ রাতের কালোয় ঢেকে যাচ্ছে। কাঁটাতারের ঠিক নিচে ছোট্ট একটি গুপ্ত গর্ত তৈরি করা হয়েছে, যাতে শুধু একজন মানুষ কোনো রকমে ঢুকতে পারবে। হামাগুড়ি দিয়ে আমি যখন দুই দেশের সীমানানির্ধারণী কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে আসছিলাম, আমার পা মাটিতে দেবে যাচ্ছিল এবং কাঁটায় লেগে আমার পিঠ ছিলে যাচ্ছিল।

আমি একটা লম্বা শ্বাস নিলাম। তারপর কিছুটা নিচু হয়ে দৌড় দিলাম, যতটা দ্রুত আমার পক্ষে সম্ভব ছিল। কারণ, আমাকে এমনটাই করতে বলা হয়েছিল। দ্রুত থেকে দ্রুততর। স্প্রিন্টের গতিতে আধা ঘণ্টা দৌড়ানোর পরই আমি সীমান্ত থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছাতে পারব। আমি ও আমার সাথিরা প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে চললাম, যতক্ষণ না বিপজ্জনক এলাকা পেরিয়ে এলাম। ওরকম পাথুরে এবড়োথেবড়ো মাটিতে সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়েও আমি খুব হালকা অনুভব করছিলাম। আমার হৃদয় দুলছিল, আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি নিজের মনে বিড়বিড় করছিলাম : আমি ফিরে এসেছি! এটা কোনো ছবির দৃশ্য নয়, এটা বাস্তব। আমি দৌড়াচ্ছিলাম আর বলছিলাম, আমি ফিরে এসেছি...আমার মাতৃভূমির বুকে!

আমাদের পেছন থেকে গুলির শব্দ আসছিল, তুরস্কের সীমান্ত দিয়ে ভারী সামরিক যান চলাচলের শব্দ পাচ্ছিলাম, তারপরও আমরা দৌড়ে পেরিয়ে এলাম। মনে হচ্ছিল যেন এমনটাই হওয়ার কথা ছিল। আমার পরনে ছিল একটা লম্বা জ্যাকেট, লুজ-ফিটিং ট্রাউজার আর মাথায় বিশেষভাবে বাঁধা

স্কার্ফ। একটা খাড়া পাহাড়ের ওপাশে আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল, আমরা সেটাও পেরিয়ে এলাম। আমার এবারের এই ভ্রমণে আমার গাইডরা এবং আমি পরস্পরের অপরিচিত ছিলাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি জানতাম না পরে আমি এসব ঘটনা লেখার সুযোগ পাব কি না; শুধু মনে হচ্ছিল আমি মরে যাব, অন্য আরও অনেকের মতো। এটাই হবে মাতৃভূমিতে আমার শেষ আগমন।

রাতের আঁধার আরও গাঢ় হলো, এখন পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল।

আরও অনেক পরে, যখন ১৮ মাসের মধ্যে আমি আরও বেশ কয়েকবার এই পথ দিয়ে ভ্রমণ করেছিলাম, তখন আমার চোখে অনেক পরিবর্তন ধরা পড়েছিল : সীমান্তের নিকটবর্তী আন্তাকিয়া বিমানবন্দরের চরম বিশৃঙ্খল অবস্থাই সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে সিরিয়ায় কী ঘটে গেছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নামার সময়, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে সামনে আমার ভাগ্যে কী ঘটতে চলেছে, এমনকি ব্যথায় কাঁপতে থাকা আমার দুপায়ের কথাও।

পাহাড়ের ওপাশের গোড়ায় পৌঁছানোর পর আমি অন্তত ১০ মিনিট ধরে চেপে বসে রইলাম, যাতে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমার যুবক সাথিরা ভেবেছিল, দীর্ঘদিন পর নিজের মাতৃভূমিতে ফিরতে পেরে আমি বোধ হয় আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি তা ভাবছিলাম না। এত দীর্ঘ সময় ধরে দৌড়ানোর ফলে আসলে আমার ফুসফুস যেন শরীর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমি তাই ফুসফুসটাকে একটু বিশ্রাম দিতে চাইছিলাম। তা ছাড়া আমি দাঁড়াতেও পারছিলাম না।

অবশেষে আমরা গাড়ির কাছে পৌঁছালাম। স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নেওয়া শুরু করলাম। দুই গাইড মায়সারা ও মোহাম্মদের সঙ্গে আমি গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসলাম। তারা দুজন ছিল একই পরিবারের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুজন যোদ্ধা এবং তাদের বাড়িতে আমার আশ্রয় নেওয়ার কথা। মায়সারা ছিল একজন বিপ্লবী যোদ্ধা, যে আসাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিল, কিন্তু পরে সশস্ত্র যুদ্ধে যোগ দেয়। মোহাম্মদ ছিল মাত্র ২০ বছরের তরুণ এবং ব্যবসা প্রশাসনের ছাত্র, যে পরে মায়সারার মতোই; প্রথমে বিক্ষোভ ও পরে সশস্ত্র যোদ্ধার তালিকায় নাম লিখিয়েছিল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ যখন আমরা একত্রে কাজ করছিলাম, সে আমার খুব

ভালো বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। গাড়ির সামনের দিকে ছিল আরেকজন যুবক ও ড্রাইভার।

আমরা ইদলিব প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, যা ছিল আসাদ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থেকে আংশিকভাবে মুক্ত একমাত্র এলাকা। যুদ্ধরত সিরিয়ান বিপ্লবী দল 'সিরিয়ান ফ্রি আর্মি'র তৈরি করা অসংখ্য রোডব্লকের মধ্য দিয়ে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাচ্ছিলাম। চারপাশে অসংখ্য জলপাইয়ের বাগান। আমি যেদিকে তাকাচ্ছিলাম সেখানেই সশস্ত্র যোদ্ধা আর বিজয়চিহ্নিত ব্যানার দেখতে পাচ্ছিলাম। নিজেকে আবেগমুক্ত রাখতে এবং আমার চারপাশের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে আমি আমার মাথাটা গাড়ির বাইরে বের করে দিয়েছিলাম। দূর থেকে ভেসে আসা শেলের শব্দের মধ্য দিয়ে আমাদের এই পথচলা মনে হচ্ছিল যেন কোনো দিনই শেষ হবে না। সেই সঙ্গে আসাদ বাহিনীর কবল থেকে অনেকটাই মুক্ত সিরিয়ার এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটিও আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে রোমাঞ্চ তৈরি করছিল।

মাটির কিছু অংশ শত্রুমুক্ত হলেও আকাশসীমার পুরোটাই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে; পুরো আকাশে যেন আগুন জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল কেউ যেন মাটির লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একের পর এক বোমা ফেলে চলেছে। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আর আমার চারপাশের জগৎটাকে নিখুঁতভাবে আমার মস্তিষ্কে তুলে নিচ্ছিলাম। ধ্বংসের মেশিন দিয়ে সাজানো চারপাশ। জ্বলন্ত আকাশ। তার মাঝখানে ধেয়ে চলা একমাত্র গাড়িতে একজন নারী আর চারজন পুরুষ জলপাই বাগানের মাঝ দিয়ে সারাকেবের দিকে ছুটে চলেছে।

আমার স্মৃতিতে সিরিয়ার যে ছবি রয়েছে তা পৃথিবীর সুন্দরতম স্থানগুলোর একটি। আমি আমার শৈশবের কথা মনে করছিলাম। রাকার নিকটে ইউফ্রেতিস নদীর পাড়ে আল-তাবকা (আল-দাওরা নামেও পরিচিত) শহরে কাটানো আমার রঙিন শৈশবের দিনগুলো আর সিরিয়ার প্রধান বন্দর শহর লাতাকিয়ার পার্শ্ববর্তী জাবলেহ শহরের উপকূল এলাকা, যেখানে আমি আমার বয়ঃসন্ধিকাল কাটিয়েছি। আমার জীবনের অনেকটা সময় আমি রাজধানী দামেস্কে আমার মেয়ের সঙ্গে একা কাটিয়েছি; আমার পরিবার, সমাজ ও আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। আমি ছিলাম স্বাধীন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতাম, কিন্তু আমার লাইফস্টাইলের জন্য আমাকে অনেক প্রত্যাখ্যান, সমালোচনা ও কটু বাক্যও শুনতে হয়েছে। রক্ষণশীল সমাজে নারী হয়ে জীবনযাপন করা অনেক কঠিন, বিশেষত যেখানে আপনার প্রচলিত নিয়মের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কোনো ধরনের পরিবর্তনের সুযোগ যেখানে নেই। উত্তর